প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সমকাল

ড. হেনা সিন্‌হা

Abstract

In Bengali literature 20th century is an important period. In this period Bengali literature became more enriched. From imaginative and fictitious literature, it emerged to realistic literature. In my article I tried to present how a realistic picture of the contemporary period can be seen in this literature of the 20th century.

যে কোনো সাবয়ব অস্তিত্বের আছে তিনটি মাত্রা - দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। অস্তিত্বের চতুর্থ মাত্রা হল সময়। সময় এক জটিল ও রহস্যময় সত্তা। যদিও সময়ের মস্তিষ্ক নেই বলে তার মনন ও চেতনাও নেই। তবুও সময়কে সত্তা বলে উল্লেখ করছি এ কারণেই - সত্তা শব্দের মূল অর্থটি অস্তিত্ববাচক। সময়কে দেখা যায় না, স্পর্শও করা যায় না। তবুও সময়ের অস্তিত্ব আছে। মানুষের মনে ও মননে সময়ের চেতনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সময়ের অস্তিত্ব একান্ত মনস্তাত্ত্বিক নয়। সময় ভৌত পৃথিবীর এক সত্য। মানুষ তার বোধ-বুদ্ধি-মেধা নিয়ে আবির্ভূত না হলেও সময় কিন্তু অস্তিত্বময় এবং সক্রিয় থাকে। সময়ের প্রবাহ অমোঘ নিয়ন্ত্রণ রাখে প্রকৃতির উপর। বৃক্ষলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; আবার কখনও জীর্ণ হয়ে ধাবিত হয় মৃত্যুর দিকে। নদী শুকিয়ে যায় কোনোদিন; আবার ভূপৃষ্ট জলমগ্ন হয় অন্য একদিন। অর্থাৎ সময়প্রবাহ প্রত্যক্ষ করবার জন্য এবং অনুভব করবার জন্য মানুষ যদি নাও থাকে তাহলেও, সময় আছে।

ভূলোকে মানুষ এল তার মস্তিষ্ক নিয়ে, চেতনা ও বুদ্ধি নিয়ে। অস্তিত্বের যে কয়েকটি মৌল শর্ত তাকে উদ্‌বেজিত করেছে প্রথম থেকে তা হল সময়ের রোধ। দিনের পরে দিন যায়, ঋতুর পরে ঋতু আসে, নদীতে কখনও জল কখনও জলহীনতা, ভূমিতে কখনও ফসল কখনও খরা; প্রাণীর জন্ম আছে বৃদ্ধি আছে আর আছে মৃত্যু।

মানুষ সময় গণনা করতে শিখেছে বহু প্রাচীনকালে। অনেক পণ্ডিতের মতে কৃষির প্রয়োজনে মানুষ সময় নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়। এক পূর্ণিমা থেকে আর এক পূর্ণিমা; এক জোয়ার থেকে আর এক জোয়ার, এক সূর্যোদয় থেকে আর এক সূর্যোদয়। এইভাবেই ধীরে ধীরে সময়কে বিভিন্ন অংশে ভাগ করতে শিখল মানুষ। সময়ের এই বিভাজন কিছুটা কাল্পনিক কিছুটা বাস্তব। দিন রাত্রির আবর্তন, ঋতুচক্রের গতিপ্রকৃতি নির্দিষ্ট সময়ান্তরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কালচক্রের এই

পরিমাপ ভৌতবিজ্ঞানের অন্তর্গত। আবার সেই সময়কে ষাট সেকেন্ড, ষাট মিনিট, চব্বিশ ঘন্টা, সাত দিন, মাস, বৎসর, এক দশক, এক শতাব্দীতে নির্দিষ্টভাবে ভাগ করার মধ্যে মানুষের কল্পনাও কাজ করেছে অনেকটা।

সময়ের ধর্ম একটাই। তা হল অনন্ত গতিময়তা। স্থির মুহূর্তে বলে কিছু নেই। যে কোনো পার্থিব অস্তিত্বের অণুতম বিন্দুটিও সময়ের বেগে বাহিত হয়। সৌভাগ্য অথবা সংকট, সুখ অথবা দুখঃ কোনোটিই স্থায়ী নয়। মানুষ যা কিছু গড়ে তোলে - গোষ্ঠী, পরিবার, সন্তান, জলে ভাসার নৌকো, চাষ করবার লাঙ্গল - সবকিছুই সময়ের স্রোতে আবির্ভূত হয়, বিবর্তিত হয় এবং কখনও কখনও অবলুপ্ত হয়। যে সমাজ, অতএব মানুষ গড়ে তুলেছে তা সর্বদাই সময়ের সঙ্গে সচল ও গতিময় হয়ে আছে। এই সত্যের কোনো ব্যতিক্রম নেই।

মানুষ যখন শিল্পসৃষ্টিতে সক্ষম হল অর্থাৎ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলিকে ছাপিয়ে বুদ্ধিকে চালিত করতে শিখল এমন কোনো কিছুর নির্মাণে যা তাকে স্বাতন্ত্র্য দেবে; তার ভাবনা কল্পনা এবং মননশীলতাকে দেবে অভিব্যক্তি তখন সেই সৃষ্টকর্ম থেকে সময়-চেতনাকে কোনোভাবেই বিযুক্ত করা গেল না। বিযুক্ত করবার কথা কেউ ভাবেও নি। সময়-চেতনা মানুষের এমনই এক অভ্যাস যে নিজেকে কোনো সময়েই সেখান থেকে সে সরিয়ে নিতে পারে না।

মানুষ যখন ভাষার ব্যবহার শিখেছে তখন থেকেই সময়কে ব্যক্ত করতে শিখেছে বিভিন্ন মাত্রায় ও বৈচিত্রে। বিপুলভাবে তার আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে অতীতকাল। আমরা কেমন ছিলাম ছিলাম; কেমন ছিল চারদিকের এই পৃথিবী - এই জিজ্ঞাসা মানুষকে নিরন্তর উদ্‌বেজিত করেছে। তাই ইতিহাসের আকর্ষণ কিছুতেই ফেরাতে পারে না মানুষ। ভাষার ব্যবহারে যখন শিল্পসৃষ্টি হল তখন তার প্রধান অবলম্বনই হল ইতিহাস। সৃষ্টিতত্ত্বের কল্পনা সেই ইতিহাস-বোধেরই এক শিল্পিত নির্মাণ। মানুষের আদি যুগের সাহিত্যে, তার মহাকাব্যে প্রাচীন নাটকে কাব্যকথায় অতীতের ঐশ্বর্যময় বর্ণনায়। অতীত থেকে বর্তমানে আসার পথটিকেও এইভাবে মানুষ মননের বিশ্লেষণে বুঝতে চেয়েছে, অনুভব করতে চেয়েছে।

মানুষের প্রাচীন যুগের গল্প শুরু হয়েছে কোনো একদিন এমন ঘটেছিল - এই উক্তি দিয়ে। মানুষ তার স্মৃতি-বিন্যস্ত যাবতীয় ঘটনা-সম্ভারের নাম দিয়েছে 'ইতি-হ-আস' - এই রূপই ছিল। ইংরেজিতে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাতেও রূপকথা, উপকথা, লোককথার প্রায়শই গল্পগুলি শুরু হয় – Once upon a time -- এই বাক্য দিয়ে। যেমন বাংলায় শুরু হয় 'এক যে ছিল' - এ শব্দ বন্ধ দিয়ে। এই অতীত-কথনের ব্যবহারিকতা থেকেই একদিন মানুষ বুঝতে শিখল সমকালের গুরুত্ব।

সমকাল অবশ্য মানুষের কাছে ব্যবহারিকতার দিক থেকে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষের গোষ্ঠীজীবন যখন কালের গতিতে এবং সভ্যতার বিকাশের ফলে দেশ, রাজ্য ও রাষ্ট্র-ধারণাকে অধিগত করতে শিখেছে তখনই দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য শাসকবর্গ এবং শাসনতন্ত্রেরও প্রয়োজন হয়েছে। শাসনতন্ত্রের কাজ কেবলই ভোগবিলাস আর শান্তি দান নয়। দেশ শাসন করতে গেলে অন্তত কিছু পরিমাণে প্রজাপালনও আবশ্যিক। তাই কীভাবে শাসিত হবে দেশ তার নিয়মতন্ত্র লিপিবদ্ধ হতে লাগল। কীভাবে চলেছে দেশে আইন-কানুন, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন এবং রাজকোষ-পূরণ এই সবই লিখে রাখার প্রয়োজন হল বিশেষভাবে। প্যাপিরাস-এ লিখিত প্রাচীন মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার করে অনেক সময় দেখা গেছে সেখানে লিখিত আছে প্রতিবছর উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ, উৎপাদনের ব্যয়, শস্য আমদানি ও রপ্তানির হিসেব। কখনও সেখানে পাওয়া গেছে পিরামিড-এর ভূগর্ভ-গৃহে সঞ্চিত ধন-সম্পদের হিসেব। এসব যখন লিখিত হয়েছিল

তখন সমকালীন বাস্তব পরস্থিতির উপযুক্ত ব্যবস্থা নির্ণয় করবার জন্যই একান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে তা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এইসব হিসেব, রাজ্য-শাসন পদ্ধতির নিয়মাবলি, অনুশাসন-সমুহ হয়ে দাঁড়াল ইতিহাসের অমূল্য উপাদান।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অনেক সময়েই কালনির্দেশক উপকরণ পাওয়া যায় অনুশাসনে, শিলালিপিতে, মুদ্রায়। যখন থেকে পুঁথির প্রচলন হয়েছে তখন লিখনকাল লিপিবদ্ধ করার অর্থাৎ সময়-সচেতনার প্রকাশ লক্ষিত হয়। প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কারের পর থেকেই সাহিত্যে লেখকদের সমকাল-দৃষ্টি সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়ে উঠি।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলে বহিরাগত ইসলামধর্মাবলম্বী শাসকের রাজত্ব শুরু হয়েছিল। প্রাচীন পশ্চিম-এশীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা এবং খ্রিস্টীয় সভ্যতার তুলনায় অর্বাচীন বলে সমকাল সম্পর্কিত চেতনা প্রথম থেকেই তাঁদের মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছিল। ভারতের পাঠান এবং মোগল শাসকেরাই রাজসভার কার্যাবলীর প্রাত্যহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখবার জন্য লেখক নিযুক্ত করতেন। বিভিন্ন ধরণের ইতিহাসগ্রন্থ সংকলনেও তাঁদের আগ্রহ ছিল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পুঁথিগুলিতে থাকত কালজ্ঞাপক শ্লোক। কোথাও কোথাও কিছু শৈথিল্য থাকলেও মোঠের উপর সেই শ্লোকগুলি থেকে পুঁথির লিপিকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়। মধ্যযুগেও বাংলাসাহিত্য যদি দেব-দেবী-কেন্দ্রিক বলে কাব্যের আখ্যান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কালপরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। কিন্তু দেব-দেবী কথা বিবৃত করবার অবকাশেই আমরা লক্ষ করেছি যে কবি নিজের কালের অভিজ্ঞতাকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন কাব্যের মধ্যে।

মানব-সভ্যতা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতে এসে যখন পৌঁছেছে তখন মানুষ প্রবলভাবে সমকাল সচেতন। সমকালীন তথ্য নিপুণভাবে সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত না হলে আধুনিক পৃথিবীতে কোনোরকম কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করা যে সম্ভব হয় না তা আজকের মানুষ জানেন। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে শুরু করে পরিবারের জমা-খরচের হিসেব – সর্বত্রই সমকালীন পরিস্থিতির বাস্তবতাকে তথ্যভান্ডারে মজুত রাখার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আজ গৃহীত হয়েছে। প্রতিটি বিষয় এখন পরিসংখ্যানের আওতায় আসে। অজস্র সংবাদ-মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে প্রত্যেকটি দিনের ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আন্তর্জাতিক তথ্যভান্ডার গড়ে উঠেছে পৃথিবীতে। তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া কোনো সামাজিক কর্মকান্ড, কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা আজ আর গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

সমকালকে সংরক্ষিত রাখবার আর এক মাধ্যম হল সাহিত্য। কোনো না কোনো অর্থে সাহিত্য সর্বদাই সমকাল সচেতন। কিন্তু ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য গভীর অভিনিবেশ সহকারে সমকালের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করায় মনোযোগী। আমাদের আলোচ্য বিষয় বিশ শতকের সাহিত্য ও সমকাল।

মানুষের অস্তিত্বের সংকট এবং রাজনৈতিক সংকট অচ্ছেদ্য। চিরকালই সাহিত্যিকরা এ বিষয়ে সচেতন; বিংশ শতাব্দীর মানুষ অনেক বেশি সচেতন। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে এই সমকালচেতনা কীভাবে দেখা দিয়েছে তা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও ধারণ করেছে লেখকের সমকালীন সমাজ বিষয়ক প্রতিক্রিয়া। এমনকি চর্যাগীতির মতো ধর্মীয় তত্ত্বপ্রধান গানেও পেয়েছি সমকালের বর্ণাশ্রমবিভাগ, বিভিন্ন জীবিকা, উৎপাদিত শস্য ইত্যাদির বিবরণ। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেম ও ভক্তির পাশাপাশি সমাজে নারীর অবস্থানও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত অনুসারী কাব্য, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনীকাব্যে অনেক সময়েই কবির আত্মবিবরণী পাওয়া যায়। সেখান

থেকেই আজ অনেকাংশে নির্ণীত হয়েছে মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাস। রামায়ণ-অনুবাদক কৃত্তিবাস, চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভাগবত-অনুবাদক মালাধর বসু, চৈতন্য-জীবনীকাব্য রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, সমকালের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অনেক সময়েই নিপুণভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁদের রচনায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় লিপিবদ্ধ আছে আরাকান-রোসাঙ-এর রাজসভায় রচিত দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের কাব্যে। এই রচনাগুলি আমাদের দেখিয়ে দেয় কেমনভাবে বাংলার প্রত্যন্ত সীমায় রাষ্ট্রীয় বিভাজন-রেখা উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের এক সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল; কেমনভাবে আরবি, ফারসি, বাংলা ভাষায় সমন্বয়ে লেখা হয়েছিল কাব্য। এই দুই কবির কাব্য না থাকলে হয়তো আমাদের জানাই হত না বাংলার সংস্কৃতির সেই বিস্তৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ইতিহাস। অষ্টাদশ শতক তীব্র সমকাল-সচেতন সাহিত্যের যুগ। এই সময়ের রাজনৈতিক বেষ্টনীটি এইরকম -- কেন্দ্রীয় মোগল শাসকের হতশ্রীদশা থেকে এর সূচনা, মধ্য লগ্নে বাংলায় মুসলমান শাসনের অবলুপ্তি এবং উত্তরার্ধের প্রায় সবটা জুড়ে কোম্পানির রাজত্বকাল। এই প্রেক্ষিতের কালচিহ্নজ্ঞাপক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল - ১৭০৭-এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু, ১৭৫৭ -এ পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৬০-এ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু এবং ১৭৬৯ (১১৭৬) খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ মন্বন্তর, আর এর মধ্যবর্তী সময়ে ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মারাঠা বর্গিদের উপর্যুপরি আক্রমণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বাধিক পরিচিত কাব্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। কাব্যের সূচনা অংশে কবি তাঁর সময়-প্রেক্ষিতের বাস্তব চালচিত্রটি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তুলে ধরেছেন। বাংলায় আলিবার্দির শাসন; মোগল সেনাবাহিনীর ভুবনেশ্বর আক্রমণ, বর্গিদের বাংলায় আসা এবং উৎপাত, বিপন্ন আলিবার্দির অর্থ দাবি করা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে, রাজা তা দিতে না পারায় তাঁকে কয়েদ করা - এভাবেই অষ্টাদশ শতকের বাংলার ইতিহাস মূল কাব্য-আখ্যানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রামপ্রসাদের শাক্তপদে সমকালীন সমাজের জীবন-যন্ত্রণার ছবি বারে বারে এসেছে, 'দুঃখ' অনিবার্যভাবেই রামপ্রসাদি সাহিত্যের একটি বড়ো বিষয় হয়ে উঠেছে। যে অর্থনৈতিক অবস্থা তখন চালু ছিল তাতে রামপ্রসাদের মতো সাধারণ মানুষের 'কপাল ভালো' হয়ে ওঠার কারণ ছিল না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নেকনজরে পড়লেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে চাষ-বাস, মামলা-মোকর্দ্দমা-ডিক্রি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, রাজত্ব আদায়ের নামে অকথ্য অপমান-অত্যাচার তখনকার সাধারণ মানুষের জীবনের নিত্যকার কাহিনি। রামপ্রসাদ সেই যুগযন্ত্রণার কথাই তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায় -

"প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
তার নামেতে নিলাম জারি।
ওই যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি,
তারে দিলে জমিদারি।।
হুজুরে দরখাস্ত
কোথা পাব টাকাকড়ি।।"

১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে রচিত গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' -এ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সংকট চিত্রিত হয়েছে। ওই সময় মারাঠাগণ পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করে তার অন্তর্গত কতকগুলি স্থান অধিকার করে নেয় এবং অর্থ আদায়ের জন্য সেখানকার লোকজনের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। এই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরই গঙ্গারাম তার 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' রচনা করেন। এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে -

"অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার বর্গীর আক্রমণ একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেভুলানো ছড়া ও লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ে ইহার প্রভাব অনুভব

করা যায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাই গঙ্গারাম কাব্যের অবলম্বন।"[১]

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য আদ্যন্ত সময়-সচেতন। উনিশ শতকের সূচনায় বাঙালির সমাজ-আন্দোলনের কয়েকটি দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন - সতীদাহ-নিবারক আন্দোলন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন, কৌলীন্যপ্রথা ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন প্রভৃতি। এ ছাড়া নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এই সময়েরই ঘটনা। উনিশ শতকের নবজিজ্ঞাসার সূচনায় ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচিত্র ঘটনাবলী সমকালীন বাংলা সাহিত্যের যে ছাপ রাখল, তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল এই পর্বের আন্দোলনাশ্রয়ী বাংলা-সাহিত্য। সর্বত্র সাহিত্য হয়ে উঠতে না পারলেও, সমকালকে তা নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে সমকাল চিত্রই ছিল প্রধান অবলম্বন। আমরা সকলেই জানি সতীদাহ প্রথা সম্পর্কিত বিতর্ক রামমোহনের লেখা এবং সমকালীন পত্রিকাগুলিতে কত ব্যাপকভাবে স্থান করে নিয়েছে। বিধবাবিবাহের প্রচলন এবং বহুবিবাহ প্রথার কু-ফল সম্পর্কে কেবল বিদ্যাসাগরই প্রবন্ধ লেখেননি, রচিত হয়েছে অজস্র নাটক এবং কোনো কোনো কাব্যও। স্ত্রীশিক্ষা আর একটি বিষয় যা অনেক কবিতায় স্থান করে নিয়েছে এবং গল্প-উপন্যাসেও শিক্ষিত মেয়েদের কথা এসেছে সমকাল চেতনার সূত্রে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকেই কেবল নয় অনেক কবতায়, কবিগানে এবং লোকগীতে নীলকরদের অত্যাচারের প্রসঙ্গ এসেছে ঘুরেফিরে।

অনেক লেখা - বিশেষত প্রবন্ধ কবিতা এবং নাটকের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সমকালের সংকটকে বিম্বিত করা। কিন্তু অনেক কাব্য এবং উপন্যাস ভিন্ন ধরণের অনুভূতি কল্পনা এবং মানব মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়েছে যখন তখন সেখানেও স্থান করে নিয়েছে সমকাল প্রসঙ্গ। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এসেছে বিধবা নারীর যন্ত্রণা এবং বহুবিবাহের সমস্যার চিত্র। রমেশচন্দ্র দত্ত অসবর্ণ বিবাহের প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁর উপন্যাসে। একটি সুন্দর উদাহরণ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। সেখানে প্রত্যক্ষ অবলম্বন রামায়ণ-কথা। কিন্তু তার ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে উনিশ শতকের বাঙালির দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা।

প্রারম্ভ-লগ্ন থেকেই বিংশ শতাব্দীর বাংলা রাজনৈতিক আন্দোলনে আলোড়িত। রাজনৈতিক সচেতনতার মতো সমকালদর্শী মনোভাব আর কোনোকিছুই নয়। ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙালি এই সময়ে, বাঙালির সাহিত্যের তাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে সমকালের অনুভব ও বাণী।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) বিরোধী আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুচতুর ইংরেজ সরকার 'ভাঙো আর শাসন করো' ('ডিভাইড অ্যান্ড রুল') পলিসি অনুসারে ভারতের বিভিন্ন অংশকে বিভক্ত করে শাসনকার্য পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই নীতি অনুসারেই ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে অসমকে বাংলা থেকে আলাদা করে তার সঙ্গে সিলেট, কাছাড় আর গোয়ালপাড়াকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। আবার ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি কার্জন বঙ্গভঙ্গের কর্মসূচি চূড়ান্ত করে তা লিখিতভাবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের জন্য ভারপ্রাপ্ত সচিব-এর কাছে। সচিব তা অনুমোদন করেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই ভারত সরকার 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' সম্মিলিত করে নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহি ডিভিশন এবং পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদা ও অসম। বঙ্গভঙ্গ বলবৎ করা হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই অভূতপূর্ব প্রতিবাদ ধ্বনিত হল বাংলা জুড়ে বাঙালি জাতিসত্তার

অন্তঃস্থল থেকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পূর্ববর্তী নরমপন্থী প্রতীবাদের সীমানা অতিক্রম করে প্রতিরোধ সংগ্রামের নতুন নতুন পদ্ধতি অর্জন করতে সক্ষম হল এবং বাংলার শহর ও গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছু শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয়ে স্বরাজের দাবি উপস্থাপিত করে দিল। বরিশাল, ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর টাঙ্গাইল, দিনাজপুর, যশোহর ইত্যাদি জেলায় অসংখ্য প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হল। বাংলায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গভঙ্গের দিন ১৬ই অক্টোবর নির্বিশেষে আপামর বাঙালির মধ্যে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হল; গীত হল 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান, বাংলার ঘরে ঘরে অরন্ধন, কলকাতায় স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হল। সুদূর মুর্শিদাবাদের জেমো-কান্দি গ্রামের পাঁচশতাধিক মহিলা ওই দিন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মা চন্দ্রকামিনী দেবীর আহ্বানে তাঁদের বাড়ির বিষ্ণুমন্দিরের উঠোনে সমবেত হয়েছিলেন ও অরন্ধন ব্রত পালন করেছিলেন। সেখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের সদ্য লেখা 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পড়ে শোনান রামেন্দ্রসুন্দরের ছোটো মেয়ে গিরিজাদেবী। স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশি দ্রব্য বর্জন ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ।

সমকালের সাহিত্যে ঘটেছে এই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের প্রতিফলন। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়টি রূপায়িত হয়েছে। 'বঙ্গবিভাগ', 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'ব্রতধারণ', 'বিজয়া সম্মিলন', 'শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা', 'বঙ্গব্যবচ্ছেদ', 'পার্টিশনের শিক্ষা', 'শোকচিহ্ন', 'করতালি', 'উদ্বোধন' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি-ঐক্যের অনুভূতিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন, বিদেশি প্রথাকে গ্রহণ করার প্রবণতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন, পুরুষদের পাশে মহিলাদেরও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আহ্বান করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' প্রবন্ধে মহিলাদের স্বদেশী আন্দোলনের অংশীদার করেছেন এবং কাঞ্চন ফেলে কাচ আঁচলে না বাঁধবার সংকল্প গ্রহণ করিয়েছেন। দেশমাতৃকার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই ছিল আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এ ছাড়াও বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ – প্রমথনাথ চৌধুরীর 'বয়কট' এবং 'স্বদেশীয়তা', ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী আন্দোলন এবং পলিটিক্স', 'স্বদেশীত্ব ও বিদেশী বর্জনের মাত্রা ও প্রকারভেদ', 'বঙ্গবিভাগ', 'স্বদেশী প্রচেষ্টা', নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বন্দেমাতরম', ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'দে কালীবাড়ী একশ পাঁঠা', গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী প্রসঙ্গ' ইত্যাদি।

অসংখ্য কবিতা ও গান রচিত হয়েছে সমকালে। তার মধ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের কথা উল্লেখ করতে হয়। দেশমাতৃকার জন্য নিবেদিতপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত স্বদেশি কবিতা ও গান রচনা করে দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ ও কবিহৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করেছেন। এগুলি 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় (ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা – ১৩১২ব.), 'বাউল' নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'আমার সোনার বাংলা', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে', 'আমাদের যাত্রা হল শুরু', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'এবার তোর মরা গাঙে', 'যদি তোর ডাক শুনে', 'সার্থক জনম আমার', 'ও আমার দেশের মাটি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস', 'আমি ভয় করব না', 'এখন আর দেরি নয়', প্রভৃতি গান এই সময় পর্বের রচনা। মুকুন্দ দাস লিখলেন – "ছেড়ে দে ও কাঁচের চুড়ী বঙ্গনারী / কভু হাতে আর পোরো না," রজনীকান্ত সেন – "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় / মাথায় তুলে নে রে ভাই," "আমরা, নেহাৎ গরিব, আমরা নেহাৎ ছোট", অতুলপ্রসাদ সেনের 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', 'মোদের গরব মোদের আশা',

'বলো বলো বলো সবে', 'হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর', 'মোরে কে ডাকে আয় রে বাছা', 'কতকাল রবে নিজ-যশ-বিভব অন্বেষণে', 'পরের শিকল ভাঙ্গিস পরে', 'প্রবাসী চল রে দেশে চল' ইত্যাদি গান তখন মানুষের মুখে মুখে ঘুরত। সেইরকম দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ভারত আমার ভারত আমার' প্রভৃতি গানও ছিল বেশ জনপ্রিয়, বিহারীলাল রায়ের 'স্বদেশ গাথা' (১৯০৫), দুর্গাদাস সিংহের 'বঙ্গবিলাপ' (১৯০৫), এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

স্বদেশি আন্দোলনের সেই সময়ে বহু কবি তাঁদের কবিতা ও গানের ডালি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম স্মরণ করা যেতে পারে - কামিনী রায়, কামিনী ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্র ভৌমিক, আব্দুল মোমিন প্রমুখ। এই সমস্ত কবি ও শিল্পীদের কবিতা ও গানে সেই সময়ের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন এবং স্বদেশি ও বিদেশী বয়কট আন্দোলনের যথার্থ রূপায়ণ ঘটেছিল।

সেইসময়ে রচিত কিছু নাটকেও আলোচ্য বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। অমরেন্দ্র দত্তের 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' (১৯০৫) নামক নাটকে (সোজাসুজি বিষয়টি নিয়ে লেখা) বঙ্গভঙ্গের চেহারা ফুটে উঠেছিল নানাভাবে। এ ছাড়াও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সোনার বাংলা' (১৯০৬) নাটকে এবং অমৃতলাল বসুর 'সাবাস বাঙালী' (১৯০৬) প্রহসনে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৬) নাটকে ১৯০৫-এর আন্দোলনের বিষয়টি সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে।

এই সময়ের কিছু পত্র-পত্রিকাও সমকালের আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল - 'ভাণ্ডার', 'যুগান্তর', 'সুপ্রভাত', 'প্রবাসী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', (ইংরেজি) 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন', (নবপর্যায়), 'নব্য ভারত', 'সাহিত্য', 'সোনার বাংলা', 'নবশক্তি', 'বিশ্ববার্তা', প্রভৃতি।

ছোটো গল্পেও আমরা পেয়েছি এই আন্দোলনের উল্লেখ। যোগেশচন্দ্র মজুমদারের 'রাখীবন্ধন', যশোমালিনী দেবীর 'পূজার চিঠি', আশালতা সেনের 'পরাজয়', সুরবালা দাসীর 'ব্রতধারণ', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'উকীলের বুদ্ধি', 'হাতে হাতে ফল', চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা', সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'স্বদেশী ও বিলাতী', প্রভৃতি গল্পে রাখিবন্ধন, স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের স্বরূপ ও দেশবাসীর প্রতিকারের চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

উপন্যাসেও ঘটেছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিফলন। গঙ্গাচরণ নাগ রচনা করেছেন 'রাখী কঙ্কণ', নামে উপন্যাস (১৯০৭)। রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাস। এখানে স্বদেশী আন্দোলনের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম যুগে একদিকে যেমন আন্তরিক অথচ আবেগপ্রবণ দেশপ্রেম দেখা দিয়েছিল তেমনই আবার তলায় তলায় নীতিজ্ঞানহীন স্বার্থপরতার পঙ্কিল চেহারাও দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপ চরিত্রের মাধ্যমে স্বদেশি আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্য উচ্ছ্বাস ও নীতিহীন স্বার্থপরতার চেহারাটি এঁকেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)। এই মহাযুদ্ধ জাতীয় জীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। এই যুদ্ধ ও তার প্রতিক্রিয়া সমকালীন সাহিত্যেও প্রভাব ফেলেছে। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্য খুবই সীমিত। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণে আসে কাজী নজরুল ইসলামের কথা। নজরুল ইসলাম নিজে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গিয়েছিলেন। কাজেই যুদ্ধ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি রচনা করেছেন 'বাঁধনহারা' (১৯২৭)

উপন্যাস, 'ব্যথার দান' (১৯১৯), 'হেনা' (১৯১৯) দুটি গল্প এবং 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' (১৯১৯) নামক আত্মকাহিনি মূলক গল্পটি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে সমস্ত তরুণ বাঙালি অংশগ্রহণ করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তার আগে বাঙালিকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হত না। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীনই প্রথম বাঙালিরা যুদ্ধে যেতে চান এবং 'ঊনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্ট' তৈরি হয়। সেদিন প্রাণের টানেই যুদ্ধে গিয়েছিলেন নজরুল। সৈনিকের জীবন, যুদ্ধের উদ্দীপনা মুক্ত মনে বর্ণনা করেছেন নজরুল তাঁর 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের পূর্বে প্রকাশিত এবং সমসময়ে লিখিত নজরুলের 'ব্যথার দান' এবং 'হেনা' গল্পেও আমরা কেন্দ্রীয় চরিত্রে সৈনিকের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতার কথা পাই। 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'-তে এক পলটন যুবক নিজের কথা বিবৃত করেছে। এতেও আছে সৈনিক-জীবনের প্রসঙ্গ ও বিবরণ যা নজরুলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। নজরুলের কবিতাতে ও গানে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ছবি এক সুস্পষ্টরূপ পেয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালে বা তারপরে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত) রচিত সাহিত্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৩৪ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। বাংলার সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় দুটি তরুণ-তরুণীর (অতীন্দ্র ও এলা) আত্মিক বিপ্লবের কাহিনি এই 'চার অধ্যায়'।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' (১৯২৬) উপন্যাসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গুপ্ত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এবং ইংরেজ শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্তারিত বর্ণনা উপন্যাসে নেই, যেটুকু আছে তাও রহস্যাবৃত। 'পথের দাবী'র বিপ্লবী নেতা সব্যসাচীকে ঘিরে যে রোমাঞ্চকর রহস্যময়তা সৃষ্টি হয়েছিল তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারতচন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চিত্রিত হয়েছে গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাসে। 'একদা' উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৩৯। কিন্তু এর পটভূমি ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালের বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ এবং অহিংস সত্যাগ্রহের প্রভাব তখন ক্রমশই অনুভূত হচ্ছে। ডান্ডি অভিযানের মধ্যদিয়ে গান্ধীজির দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন অমান্য আন্দোলন এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ডান্ডি অভিযান 'একদা' উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে – "তখন ডান্ডির যাত্রা শুরু হইয়াছে – অপূর্ব, অমিত দু'জনেরই মন দোদুল দোলা খাইতেছে। এক সপ্তাহ তাদের চোখে ঘুম নাই, কেবল তাহারা নিজেদের পথ খুঁজিতেছে।" ('একদা', নিরক্ষরতা সমিতি প্রকাশিত সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ. ৯৫)।

লবণ সত্যাগ্রহ বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তার চিত্রও লেখক উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন। লেখক নিজেও ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তাই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসেও সমকালের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। তারাশঙ্কর নিজেও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; তার জন্য কারাবরণও করেছিলেন। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শিবনাথ যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সমাজসংস্কারমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছে সেগুলি সবই প্রায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি।

এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় বা সমকাল চিত্রিত হয়েছে সেই সময়ের সাহিত্যিকদের রচনায়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'আগস্ট আন্দোলন' বা 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' (১৯৪২)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীনই এই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলন বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। গান্ধীজি পরিচালিত এই আন্দোলন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তীব্র হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতার দাবিতে। এই আন্দোলনের স্লোগান ছিল Quit India বা ভারত ছাড়ো। বিশ্বযুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ার ফলে ব্রিটিশ শাসক কিছুটা বিপন্ন – এমন মনে করেই সেই সময়টিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল আন্দোলনের কাল হিসেবে। সেজন্য আমরা এই আগস্ট আন্দোলনের বিষয়টি আগে সেরে নিচ্ছি। সমগ্র ভারতবর্ষেই এই আন্দোলন প্রসারিত হয়েছিল। কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রণকৌশল নিয়ে নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করে। ১৪ই জুলাই ১৯৪২ ওয়ার্ধা অধিবেশনে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৭ই-৮ই আগস্ট বোম্বাইতে (বর্তমান মুম্বাই) অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব অনুমোদন করে। ৮ই আগস্ট এ.আই.সি.সি প্রস্তাব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার পালটা পদক্ষেপ নেয়। ৯ই আগস্ট ভোরে গান্ধী সহ সব ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের দাবিতে জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠল জাতীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের পর থেকেই। অভূতপূর্ব গণরোষের বন্যা বয়ে গেল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে জনগণ দীর্ঘ দুশো বছরের ঔপনিবেশিক অত্যাচারের মূলোৎপাটনের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অভিঘাত সমসাময়িক সাহিত্যিকদেরও স্পর্শ করেছিল; লেখা হল উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাস। সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, বনফুল, মনোজ বসু প্রভৃতি লেখকগণ আগস্ট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাঁদের রচনায়।

আগস্ট বিপ্লবের ঐতিহাসিকতাকে ভিত্তি করে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'জাগরী' (১৯৪৫) উপন্যাসে। ১৯৪২ সালের নানা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এই উপন্যাস থেকে জানা যায় – জাপানের হাতে রেঙ্গুনের পতন, ক্রিপস মিশন-এর আগমন ও ব্যর্থতা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ, সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব অনুমোদন, গান্ধী, মৌলানা আজাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু প্রমুখের গ্রেপ্তার এবং আগস্ট বিপ্লবের অভিঘাত ইত্যাদি।

'জাগরী' উপন্যাসের আখ্যানভাগ নতুন ভাবনায় বিন্যস্ত। বিলু, নীলু দুই ভাই আর তাদের বাবা ও মা এই চারজনের আত্মকথা একত্র গেঁথে উপন্যাসটির কলেবর তৈরি করা হয়েছে। ১৯৪৩-এর মে মাসের একটি রাত্রি, ভোর হতে না হতে আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের একজন বিদ্রোহ নেতা বিলুর ফাঁসি হবে। ফাঁসির স্থান পূর্ণিমা সেন্ট্রাল জেল। ওই জেলেরই আপার ডিভিশন ওয়ার্ড-এ বন্দী রয়েছেন তার একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী পিতা। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাগারে এসেছেন। সরকারি স্কুলের হেডমাস্টারের চাকরি ত্যাগ করে তিনি সরাসরি গান্ধীজি প্রবর্তিত পথের অনুগামী। ওই জেলেরই আউরৎ কিতায় তার মা বন্দী আছেন। সে যুগের অনেক বাঙালি রমণীর মতো তিনিও স্বামীর পথ অনুসরণ করে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ওই পরিবারের ছোটো ছেলে নীলু কমিউনিস্ট। সে জেল গেটে অপেক্ষা করছে দাদার ফাঁসি হলে সেই লাশ নিয়ে এসে সৎকার করবে। প্রকৃতপক্ষে দাদার বিরুদ্ধে সে যে সাক্ষী দেয় তার ফলেই

বিলুকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হতে হয়েছিল। অর্থাৎ একই রাত্রি উপন্যাসের চারটি চরিত্র ভয়ংকর জাগরণের মধ্য দিয়ে কাটাচ্ছে। এটি একটি রাষ্ট্রীয় পরিবার। রাজনৈতিক মতাদর্শের বিচারে পিতা গান্ধীবাদী এবং মাতা পিতারই আদর্শের অনুগামী, কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলু কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলু কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি। আগস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্নিয়া সেন্ট্রাল জেলের পটভূমিকায় তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনি লেখক এখানে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মন্দ্রমুখর' উপন্যাসে আগস্ট বিপ্লবের বিপুল গণজাগরণের ছবি চিত্রিত হয়েছে। বনফুলের 'অগ্নি' উপন্যাসটি আগস্ট বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা একটি সংবেদনশীল রচনা। মনোজ বসুর 'আগস্ট ১৯৪২' উপন্যাসে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনের ব্যাপকতা চিত্রিত হয়েছে। সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটির পটভূমি আগস্ট আন্দোলন। সমকাল-সচেতন সাহিত্যিকরা তাঁদের এই সমস্ত রচনায় আগস্ট আন্দোলন বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন-এর অভিঘাতকে তুলে ধরেছেন। এদের মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ী রচিত 'জাগরী' উপন্যাসটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অভিনব সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্নভাবে স্পর্শ করেছিল। বাংলা সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। প্রত্যক্ষভাবে বাঙালিরা এই বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত না থাকায় যুদ্ধ-সাহিত্যের প্রত্যাশিত তীব্রতা প্রকট হয়ে ওঠেনি। তবে সংবাদপত্রে বা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সাহিত্যিকরা যুদ্ধ-পরিস্থিতিকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত করেছেন তাঁদের রচনায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। আর সেই সময় পর্বেই ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলন এবং ১৯৪৩ এর বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়াজাত মন্বন্তরও সমকালের সাহিত্যিকদের উদ্‌বেজিত করেছে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত সাহিত্যে রূপায়িত করার সময় উক্ত ঘটনাগুলিও পাশাপাশি চলে এসেছে।

১৯৪৩-এর মন্বন্তর সংক্রান্ত রচনাগুলিকে আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে প্রতিফলন সাহিত্যের দেখা দিয়েছিল তারই অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দেখব। কারণ এই মন্বন্তর ঘটানো হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকের পরিকল্পনা অনুসারে।

সেইসময় রচিত উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে প্রথমেই স্মরণে আসে গোপাল হালদারের লেখা ত্রয়ী উপন্যাস 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪) 'তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৫) এবং 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯৪৬)-র কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণামে সৃষ্ট-মন্বন্তরের কথা বিস্তৃতভাবে থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি এখানে ব্যবহৃত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ডাক্তার বিনয় মজুমদার বার্মায় থাকতেন। কিন্তু জাপান যুদ্ধে যোগ দিয়ে বার্মা আক্রমণ করায় তিনি বহু ভারতীয়ের সঙ্গে বাংলায় চলে আসেন। আর যুদ্ধের কারণে বাংলাও তখন বিপন্ন। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের স্বার্থে গ্রামের মানুষকে গৃহহীন, অন্নহীন করেছে। তিনটি উপন্যাস জুড়ে রয়েছে বাংলার এই সামাজিক বিশৃঙ্খলা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারি, মন্বন্তর, কালোবাজারি, চোরাকারবার, বোমার আতঙ্ক ও বোমা বর্ষণ ইত্যাদি বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম-জাত ঘটনা।

গোপাল হালদার 'পঞ্চাশের পথ', 'ঊনপঞ্চাশী', 'তেরশ-পঞ্চাশ' এই ত্রয়ীতে মন্বন্তরকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্লেষণী বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা দিয়ে অভিনব উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। এখানে মন্বন্তর পটভূমি মাত্র নয়, তা কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। 'পঞ্চাশের পথ' উপন্যাসে

রয়েছে আসন্ন মন্বন্তরের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি।

উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বিনয়, বার্মা-প্রত্যাগত ডাক্তার 'সমসাময়িক কালের সে সহজ ও সক্রিয় সাক্ষী'। যুদ্ধবোমায় বার্মায় জীবন বিপর্যস্ত হলে বিনয় তার নিজের গ্রাম সোনাপুরে ফিরে আসে। সোনাপুর আর কলকাতায় বিনয়ের বারবার যাওয়া-আসার সূত্রে যুদ্ধ ও মন্বন্তরের গ্রাম-শহরের চিত্র আমরা পাই। সৈন্যদের থাকার জন্য সরকার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মানুষকে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ দেয়। সৈন্যদের ব্যাভিচার নষ্ট হয়েছে গ্রামবাসীর সম্ভ্রম, সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহের জন্য বাজারে চালের অভাব ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, কেরোসিন-নুন-দেশলাই, কাপড় ইত্যাদির সংকট এখানে প্রকট হয়েছে। তার সঙ্গে আছে ব্যবসায়ী মহলের কার্যকলাপ। তারা দুর্ভিক্ষের জন্য কতটা দায়ী ছিল, যুদ্ধপরিস্থিতিকে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়ে জনজীবনে তারা কী অপরিমেয় সর্বনাশ করেছে এবং মন্বন্তরকে ত্বরান্বিত করেছে গোপাল হালদার তাঁর 'মন্বন্তরত্রয়ী'-তে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন সে সত্য। এইভাবে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলাদেশের সামগ্রিক জনজীবনের এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠেছে গোপাল হালদারের এই ত্রয়ী উপন্যাস।

সেই সময়ে রচিত যুদ্ধ-সংক্রান্ত উপন্যাসগুলিতে মোটামুটি পূর্বোক্ত বিষয়গুলিই প্রধান হয়ে উঠেছিল। ঔপন্যাসিকরা তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনা থেকে তার প্রতিরূপ দিয়েছেন উপন্যাসে। তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) উপন্যাসে বাংলায় যুদ্ধ-পরিস্থিতির বিপর্যস্ত চিত্রিত হয়েছে। মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষের চিত্র প্রধান হলেও এখানে তারাশঙ্কর যুদ্ধের ভয়াবহতা, বোমা বর্ষণের বিবরণ ও আতঙ্ক চিত্রিত করেছেন। কাজেই 'মন্বন্তর' শুধুই মন্বন্তরের উপন্যাস নয়; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটটিও গুরুত্ব পেয়েছে যথেষ্ট। তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী' (১৯৫৭) ও 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসে যুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে প্রান্তিকভাবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' (১৯৪৪) উপন্যাসে তৎকালীন দুর্ভিক্ষ এবং তার আনুষাঙ্গিক পরিস্থিতির বিশদ চিত্র রয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে লেখকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনটি দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে - প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত সমস্যা ও পরিণামে বাংলায় মন্বন্তর, দ্বিতীয়ত, ধনী বিলাসী পরিবারের অবক্ষয়, তৃতীয়ত, যুদ্ধ ও মন্বন্তরজনিত দুর্যোগ ক্ষয়িষ্ণু সমাজে কমিউনিস্ট কর্মীদের সক্রিয়তা। একদা বর্ধিষ্ণু পরে পতনশীল পরিবারের একমাত্র সুস্থ সচেতন কানাইকে উপন্যাসের কেন্দ্রে রেখে তারাশঙ্কর যুগের চেহারাটা তুলে ধরেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুবর্তন' (১৯৪২) উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে জাপানের কলকাতায় বোমা বর্ষণের আতঙ্ক ও প্রতিক্রিয়া। বোমার ভয়ে কলকাতা ত্যাগ করার কথা, শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনে তাড়াতাড়ি শহর ছাড়ার তাগিদে মানুষের প্রতিযোগিতা ব্যক্ত হয়েছে।

বরেন বসুর 'রঙরুট' (১৯৪৫) উপন্যাসে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক জীবন্ত চিত্রণ। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমল সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে। প্রকৃত অর্থেই এটি যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উপন্যাস। দেবেশ দাসের লেখা 'রক্তরাগ' (১৯৫৬) উপন্যাসেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যুদ্ধের পরিণাম চিত্রিত হয়েছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' (প্রথম চরণ ১৯৪৯, দ্বিতীয় চরণ ১৯৫১) উপন্যাসে যুদ্ধকে দেখিয়েছেন পিছিয়ে পড়া (তাৎমা, ধাঙর, সাঁওতাল) মানুষের বীক্ষণ-বিন্দু থেকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের ঔপন্যাসিকরা তাঁদের উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চালচিত্র রচনা করেছেন। তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে হেমিংওয়ে-এর 'ফর হুম দ্য বেল টোল্‌স', 'আ ফেয়ার ওয়েল টু আর্মস' কিংবা এরিখ মারিয়া

রেমার্ক এর 'অল কোয়ায়েট অন্ দ্য অয়েসটার্ন ফ্রন্ট'-এর মতো প্রকৃত যুদ্ধ-উপন্যাস বাংলায় রচিত হয়নি। একমাত্র বরেন বসুর 'রঙরুট' উপন্যাসে সত্যিকারের যুদ্ধের কিছু অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে রচিত কিছু ছোটো গল্পেও যুদ্ধ এবং তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, মন্বন্তর, গ্রাম উজার হয়ে যাওয়া, রেশন-কন্ট্রোল, কালোবাজারি, চাল-কেরোসিন-বস্ত্র সংকট, চোরাকারবার, মজুতদারি, সামাজিক অবনমন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নারীর সম্ভ্রমহানি ও নৈতিক অবক্ষয় এর প্রসঙ্গ। ছোটো গল্পের স্বল্প পরিসরে যে কোনো একটি দিককে নির্বাচন করে গল্পকার একতম প্রতীতির উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন। কখনও কখনও বিষয়গুলি কিছুটা পরস্পর-লগ্ন রূপেও স্থান পেয়েছে ছোটোগল্পে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিন শূন্য' (১৯৪৪) গল্পে যুদ্ধের প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়েছে। যুদ্ধের কারণেই যে মন্বন্তরের সৃষ্টি সে কথা স্পষ্টই উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর 'ইস্কাপন' (১৯৫০) গল্পেও রয়েছে বোমা-বিধ্বস্ত কলকাতার বর্ণনা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যানিক' (১৯৪৬) গল্পটিকে যথার্থই একটি যুদ্ধের গল্প বলা যায়। কলকাতার বুকে বোমা পড়ার আতঙ্ক এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জীবনে যুদ্ধ কীভাবে ভাঙন ধরায় – তারই রূপায়ণ 'প্যানিক' গল্পটি। নবেন্দু ঘোষের যুদ্ধ-বিরোধী 'পলাতক' (১৯৪৫) গল্পের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলির ডাকে' (১৯৪২) গল্পে যুদ্ধের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। যুদ্ধ কীভাবে শান্ত গৃহকোণে অশান্তি বয়ে এনেছে এবং বোমায় কত সহস্র মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে তার জীবন্ত চিত্রণ এই গল্পটি। পুরোপুরি যুদ্ধ-কেন্দ্রিক গল্প এই 'কর্ণফুলির ডাকে'।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' (১৯৪৪) নাটকটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। জাপানি বোমার ভয়ে হিন্দু-মুসলিম দুই পক্ষই সম্প্রদায়গত বিভেদ ভুলে আশ্রয় নিয়েছে মন্দিরে বা মসজিদে। নাটকের শেষে হিন্দু-মুসলিম সকলে মিলে জাপানকে প্রতিরোধ করার সংকল্পে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা নাটকে যুদ্ধ-প্রসঙ্গ সে রকমভাবে স্থান পায়নি। বাংলা কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ বেশ বড়ো একটা জায়গা করে নিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ভিন্ন ভিন্নভাবে বাঙালির উপলব্ধির জগৎকে আলোড়িত করেছিল। বাঙালি কবিরা তাঁদের উপলব্ধিকে, অনুভবকে উজাড় করে দিয়েছেন কবিতায়।

অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার' সংকলনের বেশ কয়েকটি কবিতায় মহাযুদ্ধ এবং তার ফল হিসেবে দুর্ভিক্ষের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। 'অন্নদাতা', 'অন্ন দাও', '১৩৫০', 'দূরের ভাই', 'নিমন্ত্রণ' প্রভৃতি বিশিষ্ট কবিতায় রয়েছে কবির সেই অনুভবের প্রকাশ।

অমিয় চক্রবর্তীর যুদ্ধ-শেষের জার্মানিতে দাঁড়িয়ে লেখা একটা কবিতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ---

"বোমা ভাঙা অবসান।
.....
ঘাড় মোচড়ানো বহু গির্জা-ঘর ছড়ানো রাস্তায়;
যিশু মাতৃমূর্তি রক্তমাখা
শুকনো পড়ে আছে ধারে ঘাসে ঢাকা,
চতুর্দেশী সৈন্যরাজ কীর্তির ওড়ায় পতাকা।"
('ডুসেলডর্ফ', 'পারাপার')

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় এভাবেই উঠে এসেছে সমকাল।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়াতেও দেখি কলকাতায় জাপানি বোমা পড়ার আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রিত মানুষের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা।

"খুড়ো হে খুড়ো গর্ত খুঁড়ো
গর্তে ঢুকে গপ্‌পো জুড়ো!
সঙ্গে রেখো নস্যি গুঁড়ো

হঠাৎ হাঁচির কামান ছুঁড়ো।" ('হিতোপদেশ', '১৯৪২')।

বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, মণীন্দ্র রায়, দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন প্রমুখ সমকালের কবির বিভিন্ন কবিতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মূর্ততা পেয়েছে নানাভাবে।

সমকালীন কথাসাহিত্যিকগণ, নাট্যকাররা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে মন্বন্তরের ভয়াবহতা এবং এর সুদূরপ্রাসারী রূপকে সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন। বিজন ভট্টাচার্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়, সোমনাথ হোড়, জয়নাল আবেদিনের ছবিতে দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। একদা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ যে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল এই দুর্ভিক্ষের সময় তার অসহনীয় বিভীষিকাময় চিত্র ধরা পড়েছে সেদিনের শিল্পসাহিত্যে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশের ক্লিষ্ট চেহারাটি ধরা পড়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে। গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত আলোচ্য উপন্যাসটিতে বিভুতিভূষণের সমকালীন অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন রয়েছে। আসন্ন মন্বন্তরের প্রতিদিন শোনা যায় উপন্যাসের সূচনায়। আমতলাতে পড়ে থাকা মতি মুচিনীর মৃতদেহ গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে - ওই রকম অবস্থা সকলের হতে পারে। সে যেন অনাহারে প্রথম মৃত্যুর 'অশনি-সংকেত'। উপন্যাসের শেষে সে আশঙ্কাই সত্যি হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় চরিত্র গঙ্গাচরণ বিশ্বাসই করতে পারে না তাদের অন্নকষ্ট হতে পারে, অন্নের জ্বালায় দেহমন অস্থির হয়ে উঠতে পারে। তাই ইয়াকুব যখন তাকে পরামর্শ দেয় সময়মতো কিছু চাল আর নুন কিনে রাখতে তখন গঙ্গাচরণ অবাক হয়ে যায়। তারপর সত্যিই গঙ্গাচরণ ও তার স্ত্রী অনঙ্গ বউয়ের টনক নড়ল যখন চাল মেলে না, তা কর্পূরের মতো দেশ থেকে উধাও, কেরোসিন নেই, বাজারদর ক্রমশ বেড়ে চলেছে। লোকে কলাইসেদ্ধ, মেটে আলু, গেঁড়ি-গুগলি খেতে লাগল। ভাতের অভাবে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মৃত্যু হতে লাগল কত মানুষের। অনাহারে মতি মুচিনীর মতো মারা গেল অনেকে। গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল মানুষ। একদা অবস্থাপন্ন ও সম্মানীয় গঙ্গাচরণ দুর্ভোগের শেষ সীমায় পৌঁছায়। আলোচ্য উপন্যাসে বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন এই মন্বন্তরের জন্য দায়ী মানুষ। একদিকে মানুষ অনাহারে মৃত্যুপথযাত্রী, অন্যদিকে একদল সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী মানুষ চোরাকারবারে স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে উঠেছে।

সমাজ-সচেতন লেখক বিভূতিভূষণ সমকালীন সমাজের যন্ত্রণাবিদ্ধ রূপটিকে সাহিত্যে তুলে ধরার দায়বদ্ধতা অনুভব করেছিলেন। এই বিষয়টি আরও অনেক সাহিত্যস্রষ্টাকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে বিভুতিভূষণের বক্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে - "বাংলাদেশ যখন এত বড় মন্বন্তরের সম্মুখীন হল, তখন বাংলার রসস্রষ্টা সাহিত্যিকদের মনে তা যথেষ্ট বেদনা ও আবেগের সৃষ্টি করে গেল। তাঁরা প্রথম চোখ মেলে দেখবার সুযোগ পেলেন। কল্পনার রসবিলাস নিয়ে সাহিত্য রচনা করলে তা আজ নিতান্ত অসার বলে পরিগণিত হবে জাতির উগ্র বেদনাবোধের সম্মুখে। জাতিকে তা সাহায্য করবে না। পথ দেখিয়ে নিতে যেতে পারবে না। দেশকে জাগাতে হবে। ..... তাঁরা ঘুম ভাঙানোর ভার নিয়েছিলেন। প্রবোধের 'অক্ষর', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' প্রভৃতি সেই ঘুম ভাঙানোর গান। ঘুম ভাঙালো কিনাজানি না, কিন্তু লজ্জিত হল অনেকে।"[২] এই সমকাল-সচেতনতা বিভূতিভূষণের সাহিত্যবোধের গভীরতার দৃষ্টান্ত।

মন্বন্তর প্রসঙ্গে আরও দুটি উপন্যাসের কথা উল্লেখ করতে হয় - সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪) এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' (১৯৪৬)। আগস্ট আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের দুর্ভিক্ষ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতজর্জর

বাংলাদেশের পটভূমিতে লেখা হয়েছে 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসটি। অবনীনাথ, শিশির, সীতাদের নিয়ে এর কাহিনি গড়ে উঠালেও দুর্ভিক্ষপীড়িতদের প্রত্যক্ষ প্রতিভূ হয়ে এসেছে বিপিন, টুনার মা, পুনি কেওটানী প্রভৃতি চরিত্র। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনতার চিত্র অঙ্কনে লেখকের স্বকীয়তার ছাপ সুস্পষ্ট। মন্বন্তরকেন্দ্রিক উপন্যাস হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্যও অবশ্যস্বীকার্য।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'চিন্তামণি' (১৯৪৬) উপন্যাসে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের জীবনে দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন। বোন চিন্তামণিকে লেখা তার দিদি হরমণির পত্রগুচ্ছের মাধ্যমে পরিস্ফূট হয়েছে দুর্ভিক্ষের নির্মম যন্ত্রণা ও দুঃসহ অভিজ্ঞতা। মন্বন্তরের দিনে সামাজিক সম্পর্কের ভাঙন ধরেছে, মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে, কিছুটা অসহায়ও হয়ে পড়েছে। উপন্যাসের শেষে কারখানায় কাজ করার কথা, আবার নতুনভাবে বেঁচে ওঠার স্বপ্নের কথা শুনিয়েছে চিন্তামণি। এইভাবে অর্থনৈতিক সংকটের পটভূমিতে মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে 'চিন্তামণি'র কাহিনি-বৃত্ত সম্পূর্ণতা পেয়েছে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে দুর্ভিক্ষের অনুষঙ্গী বস্ত্র সংকট, চোরাকারবার, নারীর সম্মানহানি ইত্যাদি বিষয়গুলিকেও স্পষ্ট করেছেন।

রমেশচন্দ্র সেনের 'শতাব্দী', মনোজ বসুর 'সৈনিক', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'যায় যদি যাক', সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'রাত্রি' প্রভৃতি উপন্যাসেও মন্বন্তরের কারণ চিত্র ধরা পড়েছে। মন্বন্তর নিয়ে ইংরেজিতে উপন্যাস লিখেছেন ভবানী ভট্টাচার্য। তাঁর 'সো মেনি হাঙ্গারস' (১৯৪৭) উপন্যাসে যুদ্ধ ও মন্বন্তরের ছবি চিত্রিত হয়েছে।

মন্বন্তরকে বিষয় করে উপন্যাসের মতো অনেক ছোটো গল্পও সেসময় লেখা হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বাঁশবাজি', 'কালনাগ', 'হাড়', 'কাক', 'কালো রক্ত' ইত্যাদি গল্পে দুর্ভিক্ষের ছাপ সুস্পষ্ট। অন্নাভাবের হাত ধরে এসেছিলেন বস্ত্রাভাব। তার নিদারুণ ছবি রয়েছে অচিন্ত্যকুমারের 'বস্ত্র', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' ইত্যাদি গল্পে। এ ছাড়াও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীরুর প্রশ্ন', 'পার্থক্য', অসাধারণ', প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'দ্বীপের মানুষ' মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কে বাঁচায় কে বাঁচে, 'ছিনিয়ে খায়নি কেন', 'নমুনা', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'ক্ষুধা', 'ক্ষুধার দেশের যাত্রী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৌষলক্ষ্মী', 'ইস্কাপন', 'মরামাটি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়', 'নক্রচরিত', 'দুঃশাসন', সোমনাথ লাহিড়ীর '১৯৪৩', নবেন্দু ঘোষের 'ত্রিশঙ্কু', বাঁকা তলোয়ার', 'কল্কি' প্রভৃতি গল্পে অন্নাভাব, বস্ত্র-সংকট, দুর্ভিক্ষজাত অসহায়তা এবং অমানবিকতার নির্মোহ নির্মম বর্ণনা চিত্রিত হয়েছে।

বিশ শতকের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তেভাগা আন্দোলন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে ইংরেজ ও জোতদার-জমিদারদের হৃদয়হীন শোষণনীতি বাংলার কৃষকদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে গরিব কৃষকরা; ভাগচাষীরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গরিব কৃষকরা নিজের জমি জোতদারের কাছে বিক্রি করে সেই জমি ভাগচাষী হিসেবে চাষ করতে বাধ্য হয়। সমস্ত জমি, সমস্ত সম্পদের মালিক হল জমিদার-জোতদার-মহাজন। এই অসহনীয় অন্যায়ের বিপজ্জনক মুহূর্তে কৃষকসভা ও কমিউনিস্ট পার্টি ডাক দিল তেভাগা-সংগ্রামের অর্থাৎ ভাগচাষিদের উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে ভাগচাষী এবং বাকি এক ভাগ পাবে জমির মালিক।

তেভাগা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে দিনাজপুর। তা ছাড়া রংপুর, জলপাইগুড়ি, যশোহর, পাবনা, ময়মনসিংহ, চব্বিশপরগণা, মেদিনীপুর, মালদা, খুলনা সহ এগারোটি জেলা। ১৯৪৭-এর জানুয়ারী থেকে বাংলার মোট উনিশটি জেলায় ষাট লক্ষ ভাগচাষী কোনো না কোনোভাবে তেভাগা

আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্নরকম প্রতিকূলতা, ভাঙচুর, লুঠতরাজ এমনকি হত্যাকাণ্ডেরও মুখোমুখি হতে হয়েছিল কৃষকদের।

এই সময়কার অবস্থা বর্ণণা প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ কুণাল চট্টোপাধ্যায় তেভাগা সম্পর্কিত তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে জানিয়েছেন, "তেভাগার দাবিতে ধানকাটা শুরু হয় নভেম্বরে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আন্দোলন এগারোটি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে ও লক্ষ লক্ষ বর্গাদার কৃষকসভার ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের খামারে ধান তোলা শুরু করে। প্রথম খণ্ডযুদ্ধে জয় তাদেরই হল কারণ একবার তাদের খামারে ধান উঠে গেলে জোতদারের পক্ষে জুয়াচুরি করে বা জোর জবরদস্তি করে ধান কেড়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই এক দেড় মাসের মধ্যে জোতদাররাও তাদের প্রাথমিক ভীতি কাটিয়ে উঠতে থাকে তাদের ভাড়াটে বাহিনীর সঙ্গে কৃষকসভার স্বেচ্ছাসেবকদের সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়। রাষ্ট্র-যন্ত্র জোতদারদের সমর্থনে নেমে পড়ে। ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ কৃষকসভার সর্বভারতীয় সভাপতি মুজফফর আহমেদ ও প্রাদেশিক সভাপতি কৃষ্ণবিনোদ রায় এক বিবৃতিতে এক সহস্রাধিক কৃষকসভার কর্মীর গ্রেপ্তারকে এবং ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও যশোহরে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনকে ধিক্কার জানান।"

বাংলা কথাসাহিত্যেও তেভাগা আন্দোলনের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। মহম্মদ আব্দুল্লাহ রসুল-এর 'আবাদ' (১৯৬৯) উপন্যাসটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার নেতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী আব্দুল্লাহ রসুল তাঁর সংগঠনের অভিজ্ঞতাকে এক্ষেত্রে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিমের আবাদ অঞ্চলে কৃষকসভার কাজকর্মের পরিধি বিস্তারে আত্মনিয়োগ এই উপন্যাসের মূল বিষয়। তার সঙ্গে এসেছে হাতেম ও তার স্ত্রী মরিয়ম-এর উপকাহিনি। সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে রয়েছে আবাদ অঞ্চলে কৃষকসভার জয়লাভের কাহিনি। পারিবারিক হাসিকান্নার অনুভূতির সঙ্গে খেটে-খাওয়া মানুষের আন্দোলনের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে 'আবাদ' উপন্যাসে।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সৌরী ঘটকের 'কমরেড' উপন্যাসটি পুরোপুরি তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। তেভাগা আন্দোলনের সেই সমস্ত উত্তাল দিনগুলো এবং জমিদার-মহাজনের শোষণে বিধ্বস্ত গ্রামীণ কৃষক সমাজের অবস্থা অত্যন্ত বাস্তবভাবে চিত্রিত হয়েছে 'কমরেড' উপন্যাসে। 'কমরেড' উপন্যাস প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুস্নাত দাসের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে – "পঞ্চাশের দশকের কয়েকটি উপন্যাসে তেভাগা কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতালব্ধ ছাপ পড়েছিল, কিন্তু পুরোদস্তুর তেভাগা কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে উপন্যাস লেখার প্রথম কৃতিত্ব সম্ভবত সৌরী ঘটকের।"[৪]

সাবিত্রী রায়ের তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ 'পাকা ধানের গান' (১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৬৫) উপন্যাসে তেভাগা আন্দোলনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বিশাল মাপের এই উপন্যাসের শেষ অংশে তেভাগা আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পেয়েছে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই', 'ছোটোবকুলপুরের যাত্রী' গল্পেও তেভাগা আন্দোলনের সাহিত্যিক প্রতিফলন ঘঠেছে। এ ছাড়া বিষ্ণু দে-র 'মৌভোগ' কবিতায় কৃষকদের সংগ্রামী জীবনের ছবি চিত্রিত হয়েছে। সলিল চৌধুরির 'হেই সামালো! হেই সামালো!' গানটি সেই সময় জনসমাজে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। অখণ্ড বাংলায় কৃষকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে স্বাধীনতার পূর্বে যে তেভাগা আন্দোলন সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তার রূপায়ণ ঘটেছে বাংলা সাহিত্যেও।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ভারত ও বাংলার বিবিধ বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় অন্যতম ঘটনাস্থল এবং আলোড়নের এক কালপর্ব সূচিত করেছে।

এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ভারতকে যেন খানিকটা জোর করেই বিশ্ব রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে দিল। অর্থনৈতিক মন্দা, মন্বন্তর এবং দাঙ্গায় বিপর্যস্ত পর্যায়গুলি পার হয়ে শেষ পর্যন্ত এল বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতা। কিন্তু সেই স্বাধীনতাও আবার দেশবিভাগের ফলে হয়ে দাঁড়াল কেবল রক্তক্ষয়ী নয় বাংলার মানুষের পক্ষে এক দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভাগ্যের কাল।

আমরা বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত যে ইতিহাস অনুসরণ করলাম সেখানে সর্বক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি সময়ের ছবি সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে বারবার। দেশকালের বৃত্ত এবং আবর্ত থেকে মানুষ নিজের মনকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে না। তাই মানুষের চিন্তন, মননে এবং সৃষ্টিতে সেই দেশকালের ছায়া পড়বেই।

সূত্র-নির্দেশ :

১। ভট্টাচার্য আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ-৪৮০।

২। পাল শ্রাবণী, *কথাসাহিত্যে পঞ্চাশের মন্বন্তর অশনি-সংকেত*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৬, পৃ-৮৯।

৩। চট্টোপাধ্যায় কুণাল, *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ-৩২।

৪। দাস সুস্নাত, *বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তেভাগা কৃষক সংগ্রামের প্রভাব ও প্রতিফলন*, 'ক্রান্তি' পত্রিকা, এপ্রিল ১৯৯৭, পৃ-২২।

সহযোগী অধ্যাপিকা, জঙ্গিপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা